

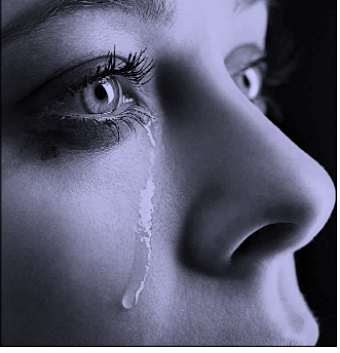
পৃথিবীর ডায়েরি

বছর ১৭, সংখ্যা: ১

প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক পত্রিকা

এপ্রিল ২০১৬

জানা অজানা

কান্নার ভাষা
বোঝে যে সকলে

মানুষ কেন কাঁদে? হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হচ্ছে, কিন্তু উত্তর মেলে নি এখনও। মানুষই সম্ভবত এক মাত্র প্রাণী যে কাঁদলে চোখের জল পড়ে। অন্য কোনও প্রাণী এমন করে কাঁদে বলে এখনও জানা যায় নি। আবার এমনও অনেক ব্যক্তি আছেন যারা কাঁদেন না। বলা ভাল, কাঁদতে পারেন না। গভীর শোকে দুঃখেও কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন না তাঁরা। চোখের জল পড়ে না তাঁদের।

কান্না সংক্রান্ত গবেষণায় এক বিখ্যাত নাম বিজ্ঞানী মাইকেল ট্রিম্বল। উনি বলেছেন মানুষ কেন কাঁদে এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের মধ্য মতের মিল নেই। আর কিছু মানুষ কেন কাঁদে না, সে বিষয়ে বিজ্ঞানী মহলে তো বিশেষ ধারণা নেই বললেই চলে। সাধারণ ভাবে মনে করা হয় কান্নার সঙ্গে যে চোখের জল পড়ে, চোখের স্বাস্থ্য ভাল রাখতেই তা হয়।

কিন্তু নেদারল্যান্ডের টিলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক অ্যাড ভিঙ্গারহোয়েটস কান্না নিয়ে এক বিরাট বই লিখে ফেলেছেন। এবং কেবল মাত্র শারীরিক কারণেই অশ্রুমোচন হয় তা মানেন না উনি। তাঁর মতে, বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চোখের জল হয়ে উঠেছে এক বিশেষ সাঙ্কেতিক ভাষা। চোখের জল আর পাঁচজনকে এবার ৫ পাতায়

শীতঘুম ভুলে জেগে আছে ভালুক

কী হিমালয় কী উত্তরমেরুতে - দেখা যাচ্ছে একই দৃশ্য

হিমালয়ের পাহাড়ে অবস্থিত রাজ্য উত্তরাখন্ড। পাহাড়, জঙ্গল, খরশ্রোতা নদী, বরফ-ঢাকা পর্বতশৃঙ্গ আর নানা ধরনের প্রাণী নিয়ে সেখানকার প্রকৃতি খুবই আকর্ষণীয়। উত্তরাখন্ডে অনেক প্রাণীর মধ্যে, চিতাবাঘ বা লেপার্ডের আনাগোনা একটু বেশি। তারা প্রায়ই গ্রামের দিকে চলে আসে। গ্রামবাসীদের পোষা জন্তু - বিশেষ করে গরু ছাগল - তুলে নিয়ে যায় হামেশাই। এমনকী মানুষকেও আক্রমণ করে বসে কখনও কখনও। তাই চিতাবাঘ সম্পর্কে সেখানকার মানুষ বেশ সতর্ক।

কিন্তু 'ডাউন টু আর্থ' পত্রিকায় প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে যে গত বছর অক্টোবর আর নভেম্বর মাসে চিতাবাঘের তুলনায় অনেক বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন ভালুকের দ্বারা। অথচ প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী তেমনটা হওয়ার কথা নয়। হিমালয়ে অনেক ভালুকের বাস। হিমালয়ের ভালুক আকারে বেশ বড় আর বদমেজাজিও বটে। তাদের সামনে পড়ে গেলে পরিণতি মোটেই সুখের হয় না। তাই লেপার্ড সম্পর্কে স্থানীয় মানুষ যতটা সজাগ, ভালুক সম্পর্কেও ঠিক ততোটাই। তবে অক্টোবর



মাস থেকে শীত শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভালুকের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভয় অনেকটাই কমে যায়।

কারণ, ভালুক সহ আরও অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রে শীত মানেই লম্বা ঘুম। শীতের মাসগুলি তারা আর খাবারের সন্ধানে বেরয় না, বরং শরীরে শক্তির প্রয়োজন কমাতে তারা কয়েকমাস ঘুমিয়ে কাটায়। তাই গ্রামের মানুষও কিছুটা স্বস্তিতে দিন কাটান এই জেনে যে ভালুকেরা তখন নিদ্রামগ্ন।

কিন্তু গত বছর শীত পড়া সত্ত্বেও, ভালুকরা ঘুমিয়ে পড়ে নি। পৌড়ি, তেহরি, যোশিমঠ,

চামোলি জেলায় তারা দিব্বি দাপিয়ে বেড়িয়েছে শীতের শুরুতে। তাদের হাতে জখম হয়েছেন বেশ কিছু মানুষ। ভালুকের এ হেন আচরণে অবাক হয়েছেন প্রাণীবিশেষজ্ঞরা। উত্তরাখন্ডের প্রধান বনপাল ডিভিএস খাতি বলেন, অনেক ভালুক সারা শীতের মরশুমটাই এখন জেগে কাটাচ্ছে। প্রথমে ভাবা হয়েছিল তাদের বাসভূমি ছোট হয়ে যাওয়ার ফলেই হয়ত তাদের এই আচরণ। কিন্তু ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া প্রাণীবিজ্ঞানী 'ডাউন টু আর্থ'-কে বলেছেন শীত যদি

তেমন তীব্র না হয়, ভালুকরা ঘুময় না। জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। খাবার খোঁজে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীজুড়েই প্রাণীদের শীতঘুমে ব্যাঘাত ঘটছে। তারা আর আগের মত নিয়ম করে শীত আসার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমতে চলে যাচ্ছে না। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে শীতের তাপমাত্রা আগে যতটা নামত এখন আর ততোটা নামছে না। ফলে অনেক প্রাণীর জীবনচক্র বদলে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে বদলাচ্ছে তাদের আচরণও।

এবার ২ পাতায়

আর মাত্র ৬০ দিন

মাত্র ৬০ দিনের পানীয় জল মজুত আছে ব্যাঙ্গালুরু শহরে। ভারতের তথ্যপ্রযুক্তির প্রাণকেন্দ্র, অথচ জলছবিটা মোটেই স্বস্তির নয় সেখানে। গত বছর খামখেয়ালি বর্ষার আনাগোনা ছিল এলোমেলো। বৃষ্টি তেমন ভাল হয় নি। তাই জলের ভান্ডার কমেছে এতোটাই যে ভাঁজ পড়েছে কর্মকর্তাদের কপালে। জল তৈরির সফটওয়্যার তো তৈরি হয়নি এখনও! না, ব্যাঙ্গালুরুতেও না। কাবিনি নামের এক বিরাট জলাধার থেকে জল আসে ব্যাঙ্গালুরুতে। সেখান থেকে জল সরবরাহ হয় কর্ণাটকের আরও তিন শহরে ও মহিশূরের কিছু

অংশে, এমনকী পাশের রাজ্য তামিলনাড়ুর সংলগ্ন এলাকায়। কিন্তু সেই জলাধারে জলের পরিমাণ এখন অনেক নীচে নেমে গেছে।

এখনও বসন্ত। গ্রীষ্মের আগমনী বার্তা ঘোষিত হয়েছে সবে মাত্র। আর এরই মধ্যে জল নিয়ে ভাবতে ভাবতে মাথার ঘাম পায়ে পড়তে শুরু করেছে ব্যাঙ্গালুর কর্মকর্তাদের। এ মাসেই যদি কয়েক বার ভারী বৃষ্টি না হয়, তাহলে জলাভাব দেখা দিতে পারে গরমের দিনগুলিতে। ইতিমধ্যেই চাষের জন্য আর জল ছাড়া হচ্ছে না কাবিনি জলাধার থেকে। আগে তো পানীয় জলের যোগান নিশ্চিত করতে হবে! সাধারণত অক্টোবর মাসে বৃষ্টি হয় সেখানে। তাতেই অনেকটা ভরে ওঠে জলাধার। কিন্তু গত বছর তা হয় নি। তাই মেঘের আশায় বসে আছে ব্যাঙ্গালুরু।

লক্ষ লক্ষ শস্য বীজ সঞ্চিত থাকবে সিন্ডিকে

বিশ্ববাসী সুনামি কিস্তি ভূমিকম্প যাই হোক না কেন সে সুরক্ষিত থাকবে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সম্পূর্ণ অক্ষত ও অবিকৃত লক্ষ লক্ষ শস্য বীজ সঞ্চিত থাকবে সেই নিরাপদ ভল্ট বা সিন্ডিকে। বর্তমান পৃথিবীতে যত ধরনের গুরুত্বপূর্ণ শস্য পাওয়া যায় সেই সব বৈচিত্র্যপূর্ণ শস্যের প্রতিনিধি তারা। আসলে ভবিষ্যতে খাদ্য সরবরাহ যাতে বিঘ্নিত না হয় ওই সিন্ডিক যেন তারই ইনসিওরেন্স পলিসি। মেরু প্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, যেখানে মানুষের তেমন যাতায়াত নেই, সেখানেই তৈরি হয়েছে ওই সিন্ডিক।

বিবিসি'র পরিবেশ সংবাদদাতা মার্ক কিনবার'র প্রতিবেদন থেকে আরও জানা যাচ্ছে যে ওই 'ডুমসডে ভল্ট' (ছবি) বা শস্য সিন্ডিকটি তৈরি হয়েছে নরওয়ে এবং উত্তর মেরুর মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত একটি প্রত্যন্ত দ্বীপে



পাহাড়ের মধ্যে। যেটি নির্মাণে খরচ হয় ৭০ লক্ষ ডলার এবং সময় লাগে ১২ মাস। এটিকে পৃথিবীর তাবৎ শস্য নমুনা সংরক্ষণের স্থায়ী সুরক্ষিত ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। এটির মালিক নরওয়ের সরকার। তবে এর রক্ষণাবেক্ষণ করছে গ্লোবাল ক্রপ ডাইভারসিটি ট্রাস্ট (জিসিডিটি) ও নরডিক জেনেটিক রিসোর্সেস সেন্টার।

এমন ভাবে এটি তৈরি হয়েছে যে বিদ্যুৎ থাক বা না থাক বীজগুলি জমাট অবস্থাতেই থাকবে। সমস্ত প্রাকৃতিক ও মানুষের তৈরি বিপর্যয়ের মোকাবিলা করেই যাতে সে টিকে থাকতে পারে সেভাবেই ভল্টের নক্সা তৈরি করা হয়। পৃথিবীর নানা দেশের থেকে বর্তমানে প্রায় ৮ লক্ষ শস্য বীজের নমুনা রয়েছে এই

ভল্টে। আসলে ২০১১'র বিশ্ববাসী ভূমিকম্প ও সুনামিতে জাপানের শস্যব্যাপক হুমকির মুখে পড়েছিল। তাই বিশেষজ্ঞরা সকলেই শস্যবীজের নিরাপত্তাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে চান। কারণ ভবিষ্যতে পৃথিবীর খাদ্য নিরাপত্তার জন্যই এটা জরুরি। এই গ্লোবাল সিড ভল্টে আয়োজিত একটি সম্মেলনে জিসিডিটি'র

এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মেরি হাগা বলেছিলেন, 'এই বাৎসরিক সম্মেলন অনেকটা বীজ বৈচিত্র্যের শীতকালীন অলিম্পিকের মতো। যেখানে পরস্পরের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিযোগীর লড়াই নেই। লড়াই আছে প্রাকৃতিক ও মানুষসৃষ্ট বিপর্যয়ের হাত থেকে বীজবৈচিত্র্যকে রক্ষা করার যা ভবিষ্যৎ মানবসভ্যতার পক্ষে অত্যন্ত জরুরি'।

বস্তুতই খাদ্য নিরাপত্তার জন্য এমন বীজ আমাদের দরকার যে খরা সহ্য করতে পারে, যে নোনা জল সহ্য করতে পারে। কারণ একদা শস্য শ্যামল অঞ্চলও ক্রমশ খরা প্রবণ হয়ে পড়ছে। অনেক জায়গা লবনাক্ত বলে চাষের অযোগ্য হয়ে পড়ে থাকছে। আশার কথা তেমন বীজ যা প্রায় হারিয়ে গেছে তাকে নতুন করে যেন আবিষ্কার করা হচ্ছে। সেই সব অমূল্য বীজ বৈচিত্র্য সংরক্ষিত থাকছে ওই সিন্ডিকের নিরাপত্তায়।

শীতঘুম

১ পাতা থেকে

এমনটা যে শুধু ভারতের হিমালয়ে ঘটেছে তা নয়। উত্তর মেরুর প্রাণীরাও নিজেদের জীবনের ভারসাম্য হারাচ্ছে। সেখানকার শ্বেত ভালুকও এক গভীর সঙ্কটের মুখে পড়েছে। তারাও জাগছে বেশি, ঘুমচ্ছে কম। আর এ অবস্থায় তাদের যতটা খাদ্য প্রয়োজন ততটা যোগাড় করে উঠতে পারছে না তারা। ফলে শক্তি কমছে শরীরে। এবং সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে গর্ভবতী মা ভালুকদের, যাদের প্রয়োজন প্রচুর পুষ্টি। তারা নিজেরাও দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং তাদের ছানারাও হচ্ছে অপুষ্টির শিকার। আর এ কথা তো সকলের জানা যে প্রকৃতির নির্মম নিয়মে দুর্বলের কোনও স্থান নেই।

পিডি

এক অমানুষিক ভালবাসার কাহিনি

প্রতি বছর প্রায় ৮০০০ কিমি সীতরে সে দেখা করতে আসে তার বন্ধুর সঙ্গে। যে বন্ধু ২০১১ সালে তাকে বাঁচিয়েছিল প্রায় অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে। সে আর কেউ নয়, খুদে এক প্যাটাগোনিয়ান পেঙ্গুইন। কিন্তু তার বন্ধু কে? অবসরপ্রাপ্ত ব্রেজিলিয়ান রাজমিস্ত্রি জোয়া পেরেইরা ডি সুজা। যিনি কিছুটা সময় মাছও ধরে কাটান, তাকে উদ্ধার করেন তিনিই।

একাগুর বছরের প্রবীণ ডি সুজা ব্রেজিলে রিও ডি জেনেইরো'র বাইরে একটি দ্বীপে পাথরের খাঁজ থেকে না খেতে পেয়ে ধুকতে থাকা, কালো তেলে চুপচুপে, অসহায় সেই পেঙ্গুইনকে উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে আসেন। তার নাম দেন ডিনডিম। তারপর সপ্তাহ খানেক ধরে তার সমস্ত পালক থেকে কালো চটচটে তেল পরিস্কার করে, গভীর মমতায় সেবা গুরুত্বপূর্ণ তাকে বাঁচিয়ে তোলেন।

রোজ মাছ খাওয়াতে থাকেন। তারপর সে শক্তি ফিরে পেলে



তিনিই তাকে সাগরের কাছে নিয়ে যান, যাতে সে নিজের জায়গায় ফিরে যেতে পারে। কিন্তু ডিনডিম ফেরে না। এভাবেই চলতে চলতে ১১ মাস পার হলে তার গায়ে সব আবার নতুন করে পালক গজালে ডিনডিম হঠাৎই একদিন উধাও হয়ে যায়। প্রতিবেশিরা বলেন আর সে ফিরবে না। ডি সুজাও তাইই মনে করেন। কিন্তু কয়েক মাস পরে তিনি হঠাৎই একদিন

আশ্চর্য হয়ে যান সেই দ্বীপে ডিনডিমকে আবার ফিরে আসতে দেখে। দুজনেই দুজনকে চিনতে পারেন। ডিনডিমের খুশি আর ধরে না। খুশি ডি সুজাও, বাড়ি ফিরে আসেন ডিনডিমকে সঙ্গে নিয়েই। সেই শুরু, ডিনডিম সেই থেকে প্রতি বছর ৮ মাস ডি সুজার সঙ্গে কাটায়। বাকি ৪ মাস প্রজননের জন্য সে আর্জেন্টিনা ও চিলির উপকূলে তাদের নিজস্ব

কলোনিতে কাটিয়ে আসে।

নিঃশঙ্ক সেই পেঙ্গুইন প্রতিবারই ওই দীর্ঘ সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে ডি সুজার কাছে ফিরে আসে। গ্লোবো টিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ডি সুজা জানান, 'ওই পেঙ্গুইনকে আমি সন্তানবৎ ভালবাসি। আমার মনে হয় পেঙ্গুইনও আমাকে তেমনই ভালবাসে। তবে ডিনডিম কাউকে তার গায়ে হাত দিতে দেয় না। কেউ তেমন সাহস

দেখালেই সে ঠোকার মারে। কিন্তু আমি তাকে অবলিলায় স্নান করাই, সার্ভিন মাছ খাওয়াই। তাকে কোলে করি। সে আমার কোলে দিব্যি শুয়েও থাকে।' এবং প্রতি বছর সে যখন ফিরে আসে ডি সুজাকে দেখলেই পোষা কুকুরের মতো ডিনডিম লেজ নাড়তে থাকে, মুখে আনন্দের শব্দ করে। সূত্র: ডেইলি মেল



পাফিন

এক রঙা নয়, উজ্জ্বল কমলার সঙ্গে ধূসর নীল রঙে রঞ্জিত তার বিশাল ঠোঁট। আর তার সঙ্গে ম্যাচ করে হাঁসের মতো পায়ে পাতাও কমলা রঙের। পাফিন ঘন্টায় ৮৮ কিমি বেগে উড়ে যেতে পারে এবং অতি দক্ষ সাঁতার। এই মজার পাখিটি মাছ শিকারের জন্য জলের তলায় ডুব দিতে পারে ৬০ মিটার। কালো সাদা লোমে ঢাকা, হাবভাবে অনেকটা যেন পেঙ্গুইন। প্রজননের সময় হলেই উত্তর আটলান্টিক সাগর উপকূলের কলোনি হাজার হাজার পাফিনের কোলাহলে মুখর হয়ে ওঠে। শীতের সময় তাদের ম্যাড়ম্যাড়ে ধূসর রঙের ঠোঁটই বসন্ত সমাগমে উজ্জ্বল কমলা হয়ে ওঠে। সঙ্গী আকর্ষণেই না কি এমন রঙ বদল ঘটে। পরমায়ু ২০ বছর। আজীবন একই সঙ্গীর সঙ্গে কাটায় তারা।

আর বসা নয়, উঠে দাঁড়াতে হবে সিঁড়ি ভাঙলে বুদ্ধি খোলে

বসে থাকা ভাল নয়। গবেষকরা বলছেন দিনে তিন ঘন্টার বেশি বসে কাটানো শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। অথচ আজকের দিনে অনেককে কেবল বসে বসেই কাজ করে যেতে হয় আট, দশ ঘন্টা। পৃথিবীর ৫৪ দেশে গবেষণা করে দেখা গেছে যাঁরা দিনে তিন ঘন্টার বেশি বসে কাটান, তাঁদের শরীর একটু তাড়াতাড়ি নড়বড়ে হয়ে পড়ে। ‘অ্যামেরিকান জার্নাল অফ প্রিভেন্টিভ মেডিসিন’এ এই গবেষণার ফলফল প্রকাশিত হয়েছে। তাই বলা হয়েছে বেশি সময় বসে থাকার অভ্যাসটা বদলানর



চেষ্টা করা উচিত। একবারে না হলেও একটু একটু করে করলেও তা শরীরের পক্ষে ভাল। যদিও গবেষকরা এটাও বলেছেন যে অনেক মানুষের জীবনযাপন এখন এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে বেশিরভাগ

সময়টাই তাঁরা বসে কাটাচ্ছেন। বিশেষ করে যাঁদের প্রতিদিনের কাজ কম্পিউটারের ওপর নির্ভরশীল, তাঁরা বসে কাজ করতে একপ্রকার বাধ্যই হচ্ছেন।

সূত্র: ইউরেকা অ্যালাট

নিজের ভাল চাইলে, সিঁড়ি দিয়েই ওঠা ভাল। বলা হয়, সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠলে শরীর ভাল থাকে। হাত, পা, পেঁয়ী সব শক্তপোক্ত হয়ে ওঠে। এখন

জানা যাচ্ছে যে কেবল শরীর ভাল থাকে তাই নয়, ব্রেন বা মস্তিষ্কও থাকে সজীব। আর এও দেখা গেছে যে সেই সঙ্গে যদি পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে মস্তিষ্ক এক নবীন ভাব ধরে রাখে অনেক দিন। কানাডার কনকরডিয়া ইউনিভারসিটির গবেষকরা এ কথা জানিয়েছেন। সেখানকার গবেষণায় দেখা



গেছে যাঁরা সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করেন তাঁদের মস্তিষ্ক অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি তরতাজা থাকে। আসলে মানুষের বয়স

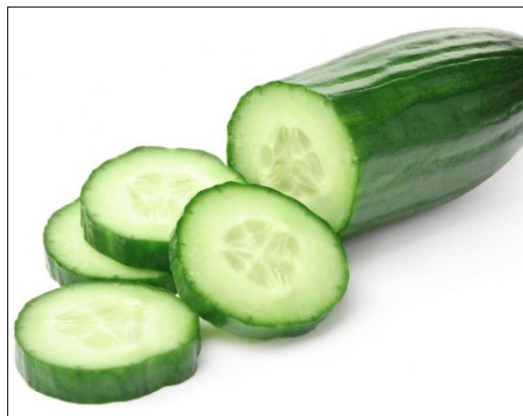
বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের ওপর তার ছাপ পড়ে। কিন্তু দেখা গেছে যাঁরা নিয়মিত সিঁড়ি ব্যবহার করে তাদের মস্তিষ্ক বয়েসের তুলনায় অনেকটাই সজীব থাকে। গবেষকরা তাই বলছেন যে, যতটা সম্ভব, সিঁড়ি ব্যবহার করাটাই ভাল, যদি না কোনও শারীরিক অসুবিধে থাকে। সূত্র: সায়েন্স ডেইলি

নানা গুণে ভরা শশা ওষুধের মতো কাজ করে

জেনে রাখা ভাল

কেউ তাকে ফল হিসেবে খায়, কেউ বা সবজি হিসেবে তাকে ব্যবহার করে। তবে যেভাবেই হোক গরম পড়লেই তার কদর বাড়ে বেশি। তরমুজ, স্কোয়াস ইত্যাদিদেরই জগতি ভাই এই শশা সম্পর্কে আরও জানা যায় যে -

- ভারতই তার উৎস ভূমি এবং এই দেশে শশার চাষ মানুষ করছে ৩০০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে।
- প্রাচীনকালে রোমানরা ওষুধ হিসেবে শশার ব্যবহার করত কাঁকড়াবিছে কামড়ালে ও খারাপ দৃষ্টিশক্তির চিকিৎসায়।
- এখন আমরা জানি কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতেও শশা বেশ উপযোগী।
- ক্যানসারের মতো নানা রোগ প্রতিরোধী গুণ সম্পন্ন



শশার দেহে ৯৫%এরও বেশি জল থাকে।
● প্রায় ১০০ প্রজাতির শশা

হয়। এবং শশার খোসা ও বীজই সব থেকে উপকারি অংশ।
● মানবদেহ শরীরে হাড় গঠনে ভিটামিন কে ব্যবহার করে। শশায় প্রচুর ভিটামিন

কে, ভিটামিন সি, পটাসিয়াম, ভিটামিন এ এবং প্রচুর খনিজ

পদার্থ আছে। ভিটামিন ডি'র পাশাপাশি ভিটামিন কে'ও হাড় ভাঙা প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা নেয়।
● শশা সাধারণত কাঁচা খাওয়া হয়। স্যালাড, সুপ, তরকারি ও আচারেও তার ব্যবহার হয়। এবং রুপচর্চার নানা উপাদান হিসেবেও কাজে লাগে শশা।
● চিনেই সব থেকে বেশি শশার উৎপাদন হয়, বছরে প্রায় ৪ কোটি টন।
সূত্র:লাইভসাইয়েন্স.কম

খাবার চিবতেই ক্লান্ত হত আমাদের পূর্বপুরুষ

আমরা যাই খাই না কেন, কখনও কি খেয়াল করি যে খাবার আমরা চিবিয়ে খাচ্ছি? এক সময় এক কম্পানি তার আইসক্রিমের সম্পর্কে বিজ্ঞাপনে বলত “মুখে দিলে গলে যায় আহারে কী পুষ্টি”! তবে, সব খাবারই যে মুখে দিলে গলে যায় এমন নয়। অনেক কিছুই আছে যা আমাদের বেশ জোরের সঙ্গে চিবতে হয় – যেমন আখ। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও, চিবতে চিবতে চোয়াল খুলে যাওয়ার উপক্রম হয় না। কিন্তু আমাদের নিকট আত্মীয় শিম্পাঞ্জি বা আমাদের সুদূরের পূর্বপুরুষরা দিনের অনেকটা সময় খাবার চিবতে ব্যয় করে থাকে বা করত। এবং চিবনো খাবার গলাধকরণ করার অবস্থায় আনতে কসরত করতে হত খুবই।

সায়েন্স ডেইলি’র একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে



যে, বিজ্ঞানীরা দেখেছেন প্রায় ২০, ৩০ লক্ষ বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষ ‘হোমো ইরেক্টাস’-দের দাঁত ছোট হয়ে যেতে থাকে আর তাদের মস্তিষ্ক আকারে হতে থাকে বড়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা বলছেন এ থেকে বোঝা যায় সে সময় এমন কিছু ঘটেছিল

যার ফলে বড় বড় প্রায় হামানদিস্তের মত দাঁতের প্রয়োজন কমে এসেছিল। আবার অপর দিকে বাড়ছিল তাদের মস্তিষ্কের আয়তন, যা প্রমাণ করে যে শরীরে পুষ্টি যাচ্ছিল ভাল মাত্রায়। ছোট দাঁত, অথচ বেশি পুষ্টি – কী করে তা সম্ভব হচ্ছিল?

অতীত কথা বলে

গবেষকদের মতে রহস্যের উত্তরটা লুকিয়ে আছে, প্রথমত, আমাদের পূর্বপুরুষদের মাংস-সাসী হয়ে ওঠার মধ্যে। আর দ্বিতীয়ত, খাদ্য বস্তু পিশে নেওয়ার সরঞ্জাম তৈরির ক্ষমতা অর্জন করায়। অর্থাৎ শক্ত

খাবার আগে ভেঙ্গে নাও, গুড়িয়ে নাও, পিটিয়ে খেঁত করে নরম করে নিয়ে, তার পর খাও। পাথর ভেঙ্গে ঘষে তারা যখন তা দিয়ে কাজের সরঞ্জাম সৃষ্টি করতে সক্ষম হল, তখন থেকেই তাদের খাওয়া-দাওয়া পাল্টাতে লাগল। খাবার চিবতে কম শ্রমের প্রয়োজন হল সেই থেকে। দাঁতের জোরও আর লাগল না আগের মত। অথচ খাবার থেকে আরও সহজে আরও বেশি পুষ্টি আহরণ করতে সক্ষম হল শরীর। ফলে, এক দিকে খাবার থেকে বেশি পুষ্টি যোগান আর অন্য দিকে খাবার চিবতে কম শক্তি ব্যয় – এই দুয়ের ফলে শরীরে যে বাড়তি শক্তি সঞ্চিত হতে থাকল প্রকৃতি ঠিক করল তা মগজ গঠনের কাজে লাগানো যাক। তাই দেখা গেল, কালক্রমে, দাঁত ছোট হচ্ছে আর মগজ হচ্ছে বড়! আর সেই সঙ্গে বাড়ছে বুদ্ধি।

গভার শিকার



হাজার চেষ্টা করেও গভার শিকার বন্ধ করা যাচ্ছে না। বন্ধ তো দূরে থাক, শিকার কমানোও যাচ্ছে না। বিগত ৯ বছর ধরে নিহত গভারের সংখ্যা প্রতি বছর ধাপে ধাপে বেড়েছে। সারা আফ্রিকা জুড়েই চলেছে এই নিধন, যার এক মাত্র কারণ হল তাদের সিং বা খড়্গ। এশিয়ার অনেক দেশে গভারের সিং-এর বিপুল চাহিদা। তাই খুব চড়া দামে বিক্রি হয় সেগুলি। ফলে, সিং-এর চাহিদা মেটাতে আর কিছু মানুষের অসৎ উপায়ে টাকা রোজকার করার ইচ্ছের শিকার হচ্ছে গভার। গত বছরে ১,৩৩৮ গভার মারা হয়েছে আফ্রিকায়। আর ২০০৮ সাল থেকে দেখলে সংখ্যাটা হবে ৫,৯৪০।

সূত্র: দ্য গারডিয়ান

এবার কাক বাঁচাতেও আইন চাই

শেষপর্যন্ত কাকদেরও আইন করে রক্ষা করতে হচ্ছে? কাকেরাও বিপন্ন হয়ে পড়েছে আমাদের পৃথিবীতে? পড়েছে কি, প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের ‘হাওয়াইয়ান ক্রো’রা। ১৯-২০ ইঞ্চি লম্বা, কালো ও বেশ মোটা ঠোঁট, অনেকটা আমাদের দাঁড়াকের মতোই দেখতে এই হাওয়াইয়ান কাক পৃথিবীতে কাক কুলের মধ্যে সব থেকে বিপন্ন বলে চিহ্নিত হওয়া সেখানকার একমাত্র কাক প্রজাতি।

বন্য পরিবেশে ১৯৮৭ সাল নাগাদ মাত্র ১০ কাকের সন্ধান মিলেছিল। তাদের মধ্যে থেকেই ৩ জোড়া প্রজননক্ষম কাককে ১৯৯৪ সালে সংগ্রহ করা হয়। যাদের ডিম ফুটিয়ে ছানাদের কিছুটা বড় করে সংরক্ষিত জায়গায় ছেড়ে দেওয়া হয়। এখন তাদের সংখ্যা ৩১। তবে ২০০৪ সালে



ঘোষণা করা হয় যে বন্য পরিবেশে আর কোনও হাওয়াইয়ান ক্রো টিকে নেই। একটু গাঢ়ো বাদামি রঙ নিয়ে কুচকুচে কালো এই কাকদের ফলমূল পোকামাকড়ই প্রধান খাদ্য। মার্চ থেকে জুলাই তাদের প্রজনন সময়। এখানকার কাকদের মতোই কাঠি, গাছের ছোটছোট ডাল

আর ঘাস দিয়ে বড় গাছে বাসা বানায় তারা। বসবাসের জন্য সাধারণত জঙ্গলই তাদের পছন্দ। বসতি ধ্বংস ও অবৈধ হত্যাই তাদের সংখ্যা কমে যাওয়ার প্রধান কারণ। তবে এর সঙ্গে বিশেষ রোগ ব্যাধি ও জোরালো

বিপন্ন যারা

বাড়বাপটাও তাদের অবলুপ্তির কারণ। বন্য পরিবেশে তারা ১৮ বছর মত বাঁচে। তবে বিশেষ ভাবে সংরক্ষণ করলে ২৫ পর্যন্ত বাঁচতে পারে। প্রকৃতিতে এই হাওয়াইয়ান কাকের ভূমিকা কিন্তু অনন্য। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বীজ বয়ে নিয়ে যায় তারা। বিশেষত হাওয়াই’র নিজস্ব বেশ কিছু উদ্ভিদের বীজ স্থানান্তর, তার অঙ্কুরিত হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে এই কাকদের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণই।

সূত্র: আরকাইভ.অরজ, উইকিপিডিয়া

চোখের জল



১ পাতা থেকে

জানিয়ে দেয় কোনও এক ব্যক্তির মনের অবস্থা। অর্থাৎ, একটিও বাক্য ব্যয় না করেও চোখের জল বলে মনের কথা। আর অন্যদের মধ্যে জাগায় সমবেদনা, তাদের করে তোলে সমব্যথী, যাতে চারপাশের মানুষজন বাড়িয়ে দেয় সাহায্যের হাত।

ভিক্টর হোয়েটস বলছেন এমনটা হওয়ার কারণ হল, জন্মের পর থেকে অনেক বছর মানুষের সন্তান সব চেয়ে অসহায় অবস্থায় থাকে। অন্য সব প্রাণীর ছানারা অল্পদিনের মধ্যেই মায়ের সঙ্গে তালমিলিয়ে চলার চেষ্টা শুরু করে দেয়। কিন্তু মানব শিশু অনেক কাল কান্নার ভাষা দিয়ে বড়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সাহায্য চায়। আর বড় হয়েও, আমরা চাই বা না চাই, শরীর বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে শৈশবের সেই কান্নাকেই ব্যবহার করে আমাদের মনের অসহায় বোধ প্রকাশ করতে। চোখের জল যে কথা বলে তা তো বোঝে সবাই।

সূত্র: টাইম

আবহাওয়া বদলাচ্ছে, খাদ্য কমছে

রৌদ, মেঘ, বৃষ্টি, তাপ, উত্তাপ, হিমের হাওয়ার আনাগোনা কেমন যেন বদলে যাচ্ছে দিন দিন। যখন যা হওয়ার, তখন যেন তা হচ্ছে না। ঋতু পরিবর্তন যে ঘটে যাচ্ছে তা এখন ঘরে বসেই টের পাওয়া যায়। আর এই আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য মানুষই যে বিশেষ ভাবে দায়ী সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা এখন প্রায় এক মত।

তারা বলছেন যে আবহাওয়া বদলে যাওয়ার ফলে পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু ঘটবে যা আগে ঘটে নি। যেমন, কোথাও প্রচণ্ড গরম পড়বে, তো কোথাও অতিরিক্ত ঠান্ডা। যেখানে বছরের এক সময় নিয়মিত বৃষ্টি হয়, সেখানে হয়তো দেখা দেবে লাগাতার খরা। উষ্ণ মরু অঞ্চলে, যেখানে সারা বছরই আকাশ থাকে মেঘহীন সেখানে আচমকা ঝামঝামিয়ে এমনই বৃষ্টি নামবে যে ঘরবাড়িতে ঢুক-বে হড়কা বানের জল। এমন ওলটপালট এখনই দেখা যাচ্ছে অনেক জায়গায়। যেমন এবার প্রায় পুরো শীতটাই কলকাতা শহর ছিল এক পানসে কুয়াশায় আচ্ছন্ন। বলমলে রৌদ্রোজ্জ্বল দিন ছিল খুব কমই। এমনটা আগে তেমন হয়নি। জানা



গেছে যে তুষার পাতের দিনে ইংলন্ডের কোনও কোনও অঞ্চলে আকাশ থেকে তুলোর মত বরফ পড়ার বদলে এমনই বৃষ্টি হয়েছে যে জলমগ্ন হয়েছে সে সব জায়গা। আর আল্পস পাহাড়ের নীচে অনন্যসুন্দর সুইজারল্যান্ডে মানুষ গ্রীষ্মের গরম অনুভব করে নি কোনও দিন – এবার সেখানে পারদ উঠেছিল ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। হাসফাস করেছে লোকজন।

এবার ‘ল্যাস্টে’ নামক বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণাকে উদ্ধৃত করে ‘টাইম’

ম্যাগাজিন জানাচ্ছে যে, বিজ্ঞানীরা ২০৫০ সালের মধ্যে এক গভীর খাদ্য সঙ্কটের আভাস পেতে শুরু করেছেন এখন থেকেই। কারণ তারা মনে করছেন আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে খাদ্য উৎপাদন বিশেষ ভাবে ব্যাহত হবে আর তার শিকার হবে মানুষ, বিশেষত পৃথিবীর গরিব মানুষ। তাঁদের মতে পুষ্টিকর খাবারের অভাবটাই প্রকট হয়ে উঠবে দিন দিন – শাক-সবজি আর ফল, যা থেকে আসে শরীর গঠনের নানা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, ক্রমেই চলে যাবে

সাধারণ মানুষের হাতের বাইরে। তারা এও জানাচ্ছেন যে আফ্রিকা আর এশিয়ার অনেক অঞ্চল – যার মধ্যে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানের মত দেশগুলিও পড়ে – বিশেষ করে অপুষ্টির শিকার হবে।

‘টাইম’ বলছে, গবেষণা অনুযায়ী আফ্রিকায় সঙ্কট ইতিমধ্যেই দানা বাঁধতে শুরু করেছে। সেখানে খাদ্যের দাম আকাশমুখী। খাদ্য উৎপাদন করতে চাষিরা হিমসিম খাচ্ছেন। আর যথেষ্ট খাবারের অভাবে প্রায় ১০ লক্ষ শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে।

দেওয়াল লিখন

পৃথিবী জুড়ে দুধের দাম কমছে কারণ দুটি দেশ - রাশিয়া আর চীন - ২০১৩ সাল থেকে বিদেশি খাদ্যবস্তু আমদানি করছে না

ফুড সিকিউরিটি অ্যালায়েন্স

অবাক পৃথিবী



- চিনের ওয়াটার ডিয়ার বা জল হরিণ আকারে এতোই ছোট যে সদ্যজাত সেই হরিণ শাবককে হাতের মুঠোয় ধরা যায়।
- এলিগেটর বা গিরগিটিরা দীর্ঘায়ু হয়। প্রায় ১০০ বছর পর্যন্ত তারা বাঁচতে পারে।
- গাছেরা কিন্তু মানুষের মতো বুড়ো হয়ে মরে না। হয় কোনও রোগ বা পোকামাকড় তাকে ধ্বংস করে। আর নয় তো মানুষের হাতে তার মৃত্যু ঘটে।
- নীল তিমি আকারে বিশাল, তেমনি তার ওজন। তা নয় নয় করেও তার ওজন হবে প্রায় ৩০ হাতির সমান।
- এমন অনেক অর্কিড আছে যাদের টিকে থাকার জন্য মাটির কোনও প্রয়োজন হয় না। বাতাস থেকেই তারা তাদের সব পুষ্টি সংগ্রহ করে নেয়।



পুকুর উধাও মিরাতে

উত্তর
প্রদেশের
মিরাত শহরে
আর কোনও
জলাশয়
অবশিষ্ট নেই।
যা আছে তা



রয়েছে সেনা
ছাউনি বা ক্যান্টনমেন্ট
এলাকায়। রিপোর্টে প্রকাশ যে
শহরের অন্য এলাকাগুলিতে
সব পুকুরই ভরাট হয়ে গেছে।
গ্রামের দিকেও একই অবস্থা।
এক সময় মিরাত জেলায় তিন
হাজারের কিছু বেশি জলাশয়
ছিল। এখন আছে মাত্র এক
হাজারের একটু বেশি। বাকি দু
হাজার পুকুর উধাও হয়ে
গেছে।

উত্তর ভারতের এক প্রাচীন
শহর মিরাত। বলা হয় হরপ্পা
সভ্যতার অঙ্গ ছিল এই
জনপদ। এই মিরাতই আবার
ছিল সিপাহি বিদ্রোহের এক
গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। আর
স্বাধীনতা সংগ্রামে এর ছিল
বিশেষ অবদান। মিরাতে যে
সেনা ছাউনি আছে তা ভারতের
দ্বিতীয় বৃহত্তম। সব চেয়ে বড়টি
আছে কিছু দূরে, আরও এক
খ্যাতনামা শহর কানপুরে।
গ্রীষ্মকালে যেন আকাশ থেকে

আগুন ঝরে মিরাতে। এপ্রিলের
শুরু থেকে পারদ চড়তে থাকে
একটু একটু করে। গরম যখন
তুঙ্গে, তখন তাপমাত্রা গিয়ে
ঠেকে ৪৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।
সেই দাবদাহে প্রাণ অতিষ্ট হয়ে
ওঠে প্রাণী মাত্রই। অথচ
সেখানেই ভরাট হয়ে গেছে
শহরের সব জলাশয়, যা স্থানীয়
আবহাওয়ায় একটু হলেও
সহনশীল রাখত।
অনেকের মতে মিরাত শহরে
খুব দ্রুত উন্নয়ন হচ্ছে।
সেখানে রাস্তাঘাট, উড়ালপুল,
নতুন বসতি, ব্যবসা-বানিজ্যের
রমরমা এখন। বলা হয়
ভারতের উন্নয়নশীল শহরগুলির
মধ্যে মিরাত এখন ১৪ নং স্থানে
আছে। আর এই কারণেই
পুকুর ভরাট করে জমি তৈরি
হচ্ছে সেখানে। কারণ, জমির
দাম অনেক। তবে জলাশয়ের
দাম যে কত সে কথা কেউ
খেয়াল করে না।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

কুইজ?!?!

- ১। দু'জন আমেরিকান, স্কট কেলি আর মার্ক কেলি কি করেছেন, যা পৃথিবীর অন্য কোনও জমজ ভাইরা করেন নি?
(ক) মহাকাশে গেছেন (খ) অলিম্পিকে ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হয়েছেন (গ) পদার্থবিদ্যাতে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন (ঘ) আলাদা আলাদা ভাবে মানুষ খুন করে ধরা পড়েছেন
 - ২। গত শতাব্দীতে জন্মের পর নাম ছিল লাহমো ধনদুপ। পরবর্তী জীবনে ইনি কি নামে পরিচিত হন?
(ক) বর্তমান দালাই লামা (খ) চিনের নেতা মাও জে দঙ (গ) এভারেস্ট আরোহণকারি তেনজিঙ নোরগে (ঘ) ভূটানের বর্তমান রাজা জিগমে কেসর
 - ৩। এদের মধ্যে কোন নদীটির জল তিব্বতের মালভূমির হিমবাহ থেকে আসে না?
(ক) সিন্ধু (খ) ব্রহ্মপুত্র (গ) মেকং (ঘ) গঙ্গা
 - ৪। বাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই সম্বন্ধে কোন তথ্যটি ঠিক নয়?
(ক) শৈশবে মা মারা যান (খ) আসল নাম ছিল মনিকর্ণিকা (গ) বালাজি বাজিরাওয়ার সঙ্গে বিয়ে হয় (ঘ) ১৭ জুন ১৮৫৮ তে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু
 - ৫। একে কি ভারতীয় উপমহাদেশে দেখা যায়?
(ক) প্রায় ৪০ বছর বাঁচে (খ) তৃণভোজী স্তন্যপায়ী প্রাণী (গ) জন্মের সময় ওজন প্রায় ৪৫ কেজি, সাবালক অবস্থাতে ২,৩০০ থেকে ৩৬০০ কেজি (ঘ) মাথা এবং শরীর প্রায় ৩ মিটার থেকে ৪ মিটার এর কিছু বেশি আর লেজ ৩৫ থেকে ৫০ সেন্টিমিটার
 - ৬। সারা পৃথিবীতে ৫ বছরের কম বয়সি যত বাচ্চা মারা যায় তার কত শতাংশ অপুষ্টির কারণে?
(ক) ৫ (খ) ৬৫ (গ) ৩০ (ঘ) ৪৫
 - ৭। পৃথিবীতে যত মোষ আছে তার কত শতাংশ ভারতে?
(ক) ৩৬ (খ) ৮১ (গ) ৯ (ঘ) ৫৭
 - ৮। হিন্দু পুরাণের মহিষাসুর'র নাম থেকে ভারতের কোন জায়গার নাম?
৯। ভারত মহাসাগরের কোন দ্বীপ-দেশের জাতীয় ভাষা ধীবেহি?
১০। “৩২ সিংহাসন”এর কাহিনিগুলি কোন পৌরানিক রাজা কে নিয়ে?
(ক) যুধিষ্ঠির (খ) বিক্রমাদিত্য (গ) নল (ঘ) ভোজ
- উত্তর : ১/ক; ২/ক; ৩/ঘ; ৪/ গ; বাঁসির এই রাজার নাম ছিল গঙ্গাধর রাও; ৫/না, জলহস্তি আফ্রিকার বাইরে পাওয়া যায় না; ৬/ঘ; ৭/ঘ; ৮/মহিষুর বা মাইষুর; ৯/খ; ১০/খ



পৃথিবীর ডায়েরি



বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩০ টাকা (ডাক মাশুল সহ)

স্কুল, কলেজ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যে কোনও অন্য সংস্থা অথবা ব্যক্তিবিশেষ এই পত্রিকার গ্রাহক হতে পারেন। মানি-অর্ডার বা চেক দ্বারা টাকা পাঠান।
চেক লিখবেন Prithibir Diary নামে।

যোগাযোগের ঠিকানা:

প্রকাশক

পৃথিবীর ডায়েরি

সি-এল ২৫৫, সেক্টর-২, সল্ট লেক, কোলকাতা - ৭০০০৯১

ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪/৯৪৩৩০৪৬৬৯৫

পাতিরাম

(কলেজস্ট্রিট-হারিসন রোড ক্রসিং)

পৃথিবীর ডায়েরি পাওয়া যায়

একটি গাছ,
অনেক প্রাণ